আন্তর্জাতিকতার নিরিখে
ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ

পুনশ্চ

পূর্ব কথা

বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ এই ভারতবর্ষ। আজও এদেশে কোনো বিষয় সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ কিছু খুঁজে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি একই বিষয় এদেশ অতি নিম্নশ্রেণীতে আছে তাও বলা যায়। এই বিষয়ে কোনো সারাংশ লেখা খুব শক্ত। তাই এখানে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কোনো মান নির্ধারণ করলে তা প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত করে না। দেশে এবং বিভিন্ন রাজ্যে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেও একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। উচ্চশিক্ষা এমনই একটা বিষয় যেখানে ভালো মন্দ, উন্নত অনুন্নত, ঊর্দ্ধগামী নিম্নগামী তার কোনও গড়মান হয় না। কিন্তু সরকারের পর্যবেক্ষণ সব সময় সেই চেষ্টা করে থাকে। আর সংবাদ মাধ্যম, মুদ্রিত বা ইলেকট্রনিক, সব সময় তার কিছু প্রচার করে। এর উপর ভিত্তি করে বিদ্বান ব্যক্তি বা বিদ্বজনেরা বক্তৃতা দেন, তার প্রচার হচ্ছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় বা সরকারী প্রচার মাধ্যমে, বেসরকারি ইউ-টিউবে। এই সব প্রচার শুনে মনে প্রশ্ন আসে, তাঁরা দেশের গ্রাম বা অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে কখনও পদার্পণ করেননি। সেই সব এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বা শিক্ষক শিক্ষিকাদের মুখোমুখি কথা বলেননি। তাঁদের গ্রন্থাগার বা ল্যাবরেটরীতে ঢুকে দেখার সুযোগ হয়নি। অন্যান্য বিষয়ের মতো উচ্চশিক্ষার উন্নতি শুধুমাত্র শিক্ষার পরিকাঠামো এবং উপযুক্ত মানের শিক্ষকের যোগান থাকলেই হবে না। তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে যাওয়া আসার মতো প্রয়োজনীয় সড়ক, মেয়েদের জন্য নিরাপত্তা এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থা। যে সব নিরীক্ষণ করা হয় সরকারি বা বেসরকারি তরফে তার মধ্যে এগুলোর গুরুত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। এ সবের জন্য গ্রামে গঞ্জে বা অনুন্নত আদিবাসী অঞ্চলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এই সব অঞ্চলে কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত সঠিক। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ বা অন্যান্য সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারে অধিকাংশ রাজ্য সরকার উদাসীন। এই কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই আসবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের। শিক্ষক শিক্ষিকা আসবে কোথা থেকে তার জন্য কিছু অনুসন্ধান প্রয়োজন। সব পরিকল্পনায় লক্ষ্য একটা আছে ঠিক, কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর

জন্য সঠিক পথ নকশা বা রোড ম্যাপ তৈরি করা হয় না। তা করবার আগে আর্থিক সমীক্ষা করে একটি বাজেট তৈরি করা হয়। জনদরদী সরকার তার জনহিতৈষী কাজের উদাহরণ তৈরি করেন তার পরবর্তী নির্বাচনের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে। সঠিক দিশা বা পথ নিশানা না থাকায় সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। এমন বহু উদাহরণ আমরা দেখেছি।

উচ্চশিক্ষা বিষয়ে বর্তমান যুগে সরকারের উদ্দেশ্য দুটো—১। অতি উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, যে সব প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং ২। বেশি সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া। বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে এর জন্য প্রচলিত মান হলো GER (Gross Enrolment Ratio), তার অর্থ হলো সমগ্র দেশে ১৮ থেকে ২৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানুষের জন্য উপযুক্ত যে সব পাঠক্রম আছে সেই সব পাঠক্রমে কতজন উচ্চশিক্ষার জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে সেই সংখ্যাকে ১৮ থেকে ২৩ বৎসর বয়সের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে তাকে ১০০ দিয়ে গুণ করা। অর্থাৎ প্রতি একশো জন একটি নির্দিষ্ট বয়সের মানুষের জন্য যোগ্য পাঠক্রমে কতজন ভর্তি হয়েছে তার একটা হিসাব পাওয়া যাবে। অর্থাৎ যদি × সংখ্যক ঐ বয়সের জনসংখ্যা হয় আর y সংখ্যক মানুষ নথিভুক্ত হয় তবে GER হবে (y/x)১০০। এই সংখ্যা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ১০০এর বেশি হতে পারে। তার কারণ y গণনা করার সময় সব বয়সের নথিভুক্ত জনসংখ্যা ধরা হয়। তাদের মধ্যে কেউ পঞ্চাশের বেশি হতে পারে, যেমন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। তবে তা সাধারণত খুব কম ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো অতি উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, যা দেশের সম্মান রক্ষা করবে এবং যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে অধিক সংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। এই দুটি দিশা গুরুত্বপূর্ণ যার অভাব দেশে আছে। এখানে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় উচ্চশিক্ষার আওতায় আনা হয়নি তা হলো দেশের বিপুল জনসংখ্যার মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া। এর জন্য কিছু বিশেষ ধরণের প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা জনপ্রিয় হয়নি। তার অনেক কারণ আছে। যেমন—

১) এই শিক্ষার পর কাজের নিশ্চয়তা না থাকা,

২) এই চাকুরীগুলোর বেতনক্রম বেশ কম এবং তার নিশ্চয়তার অভাব,

৩) এই সব কাজের সামাজিক স্বীকৃতির অভাব।

কর্মক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য এই দশকের প্রথম থেকে একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই জন্য একটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম (National Skill Development Corporation– NSDC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রকল্পগুলিতে কয়েক লক্ষ দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তা আশানুরূপ নয়। এই সব প্রকল্পের সার্থকতার জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি কাজের সুযোগ। তা না থাকলে এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশী বা বিদেশী বেসরকারি সংস্থা তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত দক্ষ কর্মীর প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পগুলিতে নির্দিষ্ট কাজের জন্য লক্ষ্য থাকায় তাদের সার্থকতার সম্ভাবনা বেশি।

এই পুস্তকের বাংলা টাইপ করার জন্য আমার স্ত্রী নন্দিতা ঘোষকে বিশেষ ধন্যবাদ। পুস্তক প্রকাশনায় সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই শ্রী শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়কে। পুস্তকটি যত্নসহকারে প্রকাশনার জন্য ধন্যবাদ শ্রী সন্দীপ নায়ককে।

জানুয়ারি, ২০২২

প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ

সূচিপত্র

উচ্চশিক্ষা	১৩
মধ্যমানের শিক্ষা	৩৪
আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত	৫৪
প্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষা	৬১
চিকিৎসা ও আইন শিক্ষা	৭৮
উপসংহার	৮৬

উচ্চশিক্ষা

১.১ সরকারী প্রয়াস ও উদ্দেশ্য

২০১৫ সালে একটি প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY) কাজ শুরু করেছে। যার লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে চল্লিশ কোটি নাগরিককে শিল্পের জন্য উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন করে তোলা। ইতিমধ্যে গুজরাট, কর্ণাটক, এবং রাজস্থানে এর জন্য কাজ শুরু হয়েছে। এই সব প্রশিক্ষণগুলি উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই প্রকল্পগুলি সফল না হলে দেশের অর্ধেক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী চিরাচরিত স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার উপর নির্ভর করবে। সরকার দেশে এই শিক্ষার সুযোগ এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের দিকে নজর না দিয়ে উচ্চশিক্ষায় সংখ্যাবৃদ্ধি করলে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচী থাকলেও উচ্চশিক্ষিতদের জন্য বেশী সংখ্যায় সুযোগ সৃষ্টি করলে তা সার্থক হবে না, কারণ খুব বেশী সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত মানুষের চাহিদা সীমাবদ্ধ। সুতরাং তা উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে।

বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা ১৩৫ কোটি। এদের মধ্যে ১৫- ৬০ বয়সী মানুষের সংখ্যা ৬০ শতাংশের কিছু কম। ফলে এই বয়সের মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি। তার মধ্যে অন্ততঃ ২০-২৫ কোটি মানুষ উপযুক্ত বা সন্তোষজনক কাজে নিযুক্ত। ফলে পি. এম. কে. ভি. ওয়াই এর আওতায় প্রায় ৫০ কোটি মানুষ থাকে। এদের মধ্যে শারীরিক ভাবে অসুস্থ বা মানসিক ভাবে অক্ষম মানুষ আছে। সুতরাং বাকি যে জনসংখ্যা থাকে তাদের সকলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার রূপায়ণ করে ২০২২ সালের মধ্যে প্রায় সকলকে প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচেষ্টায় সদিচ্ছা থাকলেও বাকি সময়ের মধ্যে তার বাস্তবায়ন কল্পনামাত্র। এই প্রকল্প সঠিক স্থানে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গত তিন বছরে প্রায় দেখা যায়নি। গ্রামে, শহরে, মানুষের বাড়িতে, বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে এবং বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত এই প্রকল্পের বিষয় জানাবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা দেখা যায়নি।

এই সব প্রকল্পে বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা আছে। তারা না জানলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এত প্রকট যে তারা সমান্তরাল ভাবে কাজ করার চেষ্টা করে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যে সব ছাত্রছাত্রীরা আসে তাদের সামনে লক্ষ্য সঠিক থাকে না। সরকার একটু বেশী উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়ার ফলে নানা রকম নামের নানা নতুন প্রকল্প আসছে নিত্য।

মূল বিষয়ের উপর সরকারী দৃষ্টি নেই। যদি ধরে নেওয়া হয়, কিছু ছাত্রকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হল যারা তার সদব্যবহার করবে এবং বাকি সবাই প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা কৌশলে শিক্ষিত হবে। তারপর প্রশ্ন থাকে এদের সবার জন্য উপযুক্ত কাজের সুযোগ সরকারী বা বেসরকারী প্রচেষ্টায় করা যায় কিনা। তার জন্য কার্যকরী সরকারী নীতির দরকার। এটা বিশ্বায়নের যুগ। এই সময় বিদেশী সংস্থা গুলিকে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎসাহিত করা দরকার। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও বাজার দরকার। আবার সেই বিশ্বায়নের প্রশ্ন আসে। কম মূল্যে একই মানের সামগ্রী বিদেশি সংস্থা থেকে আমদানি করা সম্ভব হলে বিদেশি অর্থ লগ্নী হবে না। আবার কৌশল শিক্ষা প্রাপ্ত মানুষকে স্বেচ্ছা উদ্যোগে ছোট শিল্প তৈরি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হবার জন্য সেই বাজার প্রয়োজন। তা না হলে উচ্চ শিক্ষা বা প্রকৌশল শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। এর ফলে শিক্ষিত এবং কৌশল বা প্রকৌশল শিক্ষিত মানুষ আরও বেশি নতুন কর্মহীন মানুষের সৃষ্টি করবে। আবার সেই এক প্রশ্ন আসে, বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয়ের অভাব। আমাদের জানা নেই মানব সম্পদ উন্নয়ন বা শিক্ষা দফতর, প্রকৌশল প্রশিক্ষণ দফতর, শিল্প ও বাণিজ্য দফতর ও অর্থ দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা নিজেদের মধ্যে কতটুকু আলোচনা করেন, বিশেষ করে বিভিন্ন নীতি রূপায়ণের জন্য। বর্তমান যুগে তথ্য প্রযুক্তিতে কর্ম সংস্থানের সুযোগ থাকায় তার উপর শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভারী শিল্পের নতুন উদ্যোগ না হলে বৃহত্তর জনতার জন্য কাজের সুযোগ আসবে না। সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা বা প্রকৌশল প্রশিক্ষণ দিশাহীন হয়ে পড়বে। সবার জানা যে এই বিষয়গুলি দেশের পন্ডিত সমাজ সৃষ্টি করে না। প্রত্যক্ষ ব্যবহার না হলে এই শিক্ষা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়বে এবং দেশে বেকারত্ব বাড়বে। বেকারত্ব বৃদ্ধির অর্থ হলো দারিদ্রের বৃদ্ধি। সব সরকার দারিদ্রের দূরীকরণ প্রকল্পের নামে দরিদ্রের হাতে কিছু অর্থ দান করে বা প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে সহায়ক মূল্য ভর্তুকি দিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার তাৎক্ষণিক প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু তা ভিক্ষার দানের সমতুল্য। মানুষ যা চায় তা হলো পরিশ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক, যার দ্বারা সে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারবে, তার বাসস্থান থাকবে এবং প্রয়োজনে শিক্ষার জন্য কিছু বৃত্তি দেওয়াও প্রয়োজন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক বলতে কী বোঝায়,

তার জন্য সম্যক ধারণা স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কোনো সরকারের নেই বা কখনও ছিল না। এর একটা বড় কারণ আমাদের সমাজ অনাদিকাল থেকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। মানুষের প্রাপ্য বেতন সেই অনুসারে পৃথক ভাবে নির্দ্ধারিত হয়। কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু যেটা ন্যূনতম প্রয়োজন তা হলো জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক থাকা দরকার। জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রীরা সব সময় উচ্চ স্তর থেকে এসেছে। তার ফলে বিরাট বৈষম্য থেকে গেছে।

এই জন্য প্রয়োজন বৃত্তি শিক্ষা। তা সরকারীভাবে করা হলেও এখনও পর্যন্ত জনগণের গ্রহণযোগ্য হয়নি। সরকার দিশাহীন ভাবে নতুন কলেজ খুলছে আর উদ্দেশ্যহীন ভাবে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের সেখানে ভর্তির জন্য দৌড়চ্ছে। উচ্চশিক্ষা এবং স্নাতক পর্যায় ডিগ্রী একটা সম্মান জনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে বহুলাংশ বেকার থাকে। কিন্তু তার পরিবর্তে তাদের কোনও বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হলে তারা উপার্জনক্ষম হবে। তবু দেশ স্নাতক কর্মহীন মানুষ সৃষ্টি করে চলেছে। পরোক্ষভাবে সরকার তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। সরকারের কোনও তথ্য নেই কতজন স্নাতক ডিগ্রীধারী মানুষের প্রয়োজন হবে এদেশের। এর জন্য শিল্প এবং বাণিজ্য দপ্তর অনেক ত্রুটিপূর্ণ আশার বাণী শোনায়। কত নতুন কর্মসংস্থান হবে এবং কত নূতন শিল্প স্থাপন করা যাবে যার জন্য শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন হবে তার সম্যক ধারণা আমাদের নেই। যখন সেই প্রয়োজনীয় সংখ্যা অর্জন করা যায় না তখনই বেকারত্ব বাড়ে। এর পরিবর্তে বৃত্তি শিক্ষা দিয়ে তাদের পারিশ্রমিক দান করলে তারা বেকার থাকবে না। যেমন মোটর গাড়ী শিল্পে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশী প্রয়োজন বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য প্রশিক্ষিত মানুষ। ভারী ইস্পাত শিল্পের জন্য শিক্ষিত স্নাতক ইঞ্জিনীয়ারের তুলনায় অনেক বেশী প্রয়োজন কিছু সাধারণ প্রশিক্ষিত কর্মী। তার যোগান অবশ্য আছে। আরও বেশী প্রয়োজন কেন সেই প্রশ্ন আসতে পারে। মূলতঃ এই সব কাজের চাহিদা অনেক বেশী। যাদেরকে আমরা সাধারণত শ্রমিক আখ্যা দিয়ে থাকি, তারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলে কাজের সুবিধা হবে। তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাবে, কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন ব্যয় কমতে পারে। উৎপাদন ব্যয় কম হলে তার বাজার মূল্য কম হবে। যা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে অনেক বেশী গ্রহণীয় হবে। এর ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। একদিকে যেমন সরকারী বা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি হবে, অন্যদিকে কোষাগারে করের আয় বৃদ্ধি পাবে। এই সব চিন্তা যে সরকার বা সরকারী দপ্তর একেবারে করেনা তা নয়। তবু বৃত্তি শিক্ষা সম্বন্ধে জনচেতনা তৈরী করতে ব্যর্থ সরকার নতুন কলেজ তৈরী করে চলেছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে, কিছু স্নাতক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। এদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্তির ব্যবস্থা যা আছে তা অত্যন্ত দুর্বল।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যেমনভাবে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ক্যাম্পাসে এসে ইন্টারভিউ করে ছাত্রদের চাকুরীর ব্যবস্থা করে, কলেজগুলোতে সাধারণত তা হয় না। তার অর্থ তাদের এইসব স্নাতকদের প্রয়োজন নেই।

যদি ভাবা যায় সাধারণ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করা ছাত্রছাত্রীদের কী কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে খুব বেশী সুযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যারা স্নাতক বা কখনও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও পাঠক্রমে ভর্তি হয়ে ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট পায় তারা বিভিন্নস্তরের বিদ্যালয়ে, প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক, পড়াবার যোগ্যতা অর্জন করে। তাদের মধ্যে একটা অংশ সফল হয়ে শিক্ষকতা করে। কিন্তু বর্তমানে যে সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে, তার মধ্যে এই সংখ্যাটি অনেক কম। বর্তমান যুগে কমপিউটারে কোনও পাঠক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করলে, কিছু সম্ভাবনা থাকে। এখন সরকারী বা বেসরকারী অফিসে করণিক চাকুরীর পদ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হচ্ছে। ফলে কমপিউটারে যারা অভিজ্ঞ তাদের কিছু কাজ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেটা আগেকার করণিকের কাজের তুলনায় অনেক কম। এমন আরও অনেক কিছু কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে, যা আগে ছিল না। এতৎসত্ত্বেও ক্রমশঃ স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। কিন্তু সরকার জি.ই.আর (GER, Gross Enrolment Ratio) বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে চলেছে যাতে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সংখ্যা বৃদ্ধি করার পথে একটা অন্তরায় হল জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, সে বিষয়ে সরকারের করণীয় প্রায় নেই। সরকারের কোনও ভাবীকথনও নেই। সুতরাং সরকার প্রায় একটা অসম্ভব লক্ষ্যের দিকে দৌড়চ্ছে। তার জন্য বিরাট ক্ষতির মুখে পড়ছে মানুষের একটা বড় অংশ, যুবসমাজ। এর তুলনায় বিদ্যালয় শিক্ষার পর তাদের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম বা NSDL. (National Skill Development Corporation) এর আওতায় এনে দক্ষ কর্মী তৈরী করলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেত, অনেক মাঝারি বা ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি হত। তা পরে আরও নতুন কর্মসুযোগের সৃষ্টি করত। চিনে যেহেতু GER বেশী বা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আরও বেশী সেইজন্য ভারতবর্ষকে চিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমাদের দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশী। আবার এই যে বিরাট আয়তন,তার মধ্যে অনেকটা অংশই দুর্বল, মরুভূমি আর পাহাড়ে ঘেরা। প্রাকৃতিক অবস্থা,আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক পটভূমি উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনায় এদেশে কোনও গুরুত্ব পায় না। দীর্ঘকাল পরাধীনতা বা বিদেশী শাসকদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় পৃথিবীর অন্য অংশের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন হয়নি। এমন নদী মাতৃক দেশে খাদ্যদ্রব্যের ফলনে উপযোগী আবহাওয়া এবং উর্বর মাটি

থাকা সত্ত্বেও এখানে পরপর কিছু দুর্ভিক্ষ হয়েছে। উচ্চশিক্ষিত হলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে তা নয়, সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রয়োজন যেখানে সঠিক পরিস্থিতির বিচারে তা করা হবে। দূরদৃষ্টিহীন পরিকল্পনার ফলে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই বিষয় কোনওদিন ভাবা হয়েছে কিনা জানিনা। বৃত্তিশিক্ষা উচ্চশিক্ষা নয় এই চিন্তা এদেশে একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র।

জার্মানী এবং ইউরোপীয় অনেক দেশে বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে কয়েকটি ভাগ করা হয়। একটি ভাগে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম আছে। এমন বিদ্যালয়গুলিকে Haupt Schule বা মেইন স্কুল বলা হয়। তা ছাড়া আছে Real Schule। এই ধরণের স্কুলে ছাত্ররা দশ ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে এবং তার পর বিশেষ প্রযুক্তি শিক্ষা দেওয়া হয় এমন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। তাতে ডিগ্রী দেওয়া না হলেও তাদের জন্য অনেক চাকুরী থাকে এবং তা যথেষ্ট উচ্চ বেতনের হয়ে থাকে। এছাড়া আছে জিমনাসিয়াম। এখানকার ছাত্ররা তেরো ক্লাশ পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সুযোগ পায়। হাউপ্ত স্কুলে যারা পড়াশোনা করে তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে এমন কিছু বৃত্তিশিক্ষায় যোগ দেয় যে সেই শিক্ষার ফলে তারা মানুষের দৈনন্দিন কাজের পক্ষে সহায়ক হয়। যেমন ইলেকট্রিক বা কাঠের মিস্ত্রী বা অন্যান্য বহু মেরামতির কাজ, চুল কাটার নাপিত, বাড়ির রং করা, রেস্তোরাঁয় রান্নার কাজ বা এমন বহু কাজ আছে। আমাদের দেশে অনেক কাজ মানুষ শেখে অন্য কোনও বয়স্ক বা সিনিয়র মানুষের সঙ্গে কাজ করে বা বংশপরম্পরায় শিক্ষার মাধ্যমে। এদের অনেকের জন্য কোনও সুপরিকল্পিত শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। অনেক সময় এই কাজগুলি নিম্নস্তরের কাজ বলে এই সমাজে পরিগণিত হয়। তার একটি কারণ এদের কোনও ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট নেই। আর অন্যটি হল অপেক্ষাকৃত কম উপার্জন। শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে অনেক কিছু শেখানো হলেও তা পরে কোনও কাজে লাগেনা। অবশ্য কিছু ড্রাইভিং স্কুল বা সেলাই শেখার স্কুলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী স্থাপিত হয়েছে। কোনও পরিকল্পনা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা মালিকানায় এই সব প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাটারিং শিক্ষাদানের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রম চালু হয়েছে। এরা হোটেলের কাজের প্রথম স্তর থেকে ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত সব কাজে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়। এই পাঠক্রমকে সম্মানীয় বলে গ্রহণ করা হয়। হয়ত এর মধ্যে ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা বিষয় আছে এবং এই পাঠক্রমের শেষে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চবেতনের চাকুরী পেয়ে থাকে। চাকুরী জীবনের শুরুতে এরা অনেকেই তারকা খচিত হোটেলে রেস্তোরাঁয় পরিবেশনের কাজ থেকে শুরু করে। এই পাঠক্রমকে সরকারীভাবে উচ্চশিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিনা জানিনা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি